শ্রীরামকৃষ্ণের মিশন

প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা

অবতারবরিষ্ঠ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব সত্যই একটি যুগান্তকারী ঘটনা। বাইরে থেকে দেখলে এই আবির্ভাবকে সাধারণ ঘটনা বলে মনে হলেও এর তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। বিজ্ঞানপ্রধান এই আধুনিক যুগেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখালেন ধর্মও সম্পূর্ণভাবেই বিজ্ঞানসম্মত। মানুষের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক চেতনাকে তিনি সকলের কাছে শুধু যে প্রকাশিত করলেন তা-ই নয়, তার অর্থও পরিস্ফুট করলেন। ধর্ম কেবল পূজা, জপধ্যান ইত্যাদিতে আবদ্ধ না থেকে মানুষের সর্বাঙ্গীণ সেবাদর্শে প্রাধান্য পেল। মানুষের মধ্যেই ভগবানের উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি এবং ঈশ্বরজ্ঞানে মানুষের সেবাই সবচেয়ে বড় উপাসনা—এই তত্ত্ব শ্রীরামকৃষ্ণদেব এত সহজভাবে উপস্থাপন করেছিলেন যে সকলের তা বোধগম্য হল : ''চক্ষু বুজলে ঈশ্বর আছেন, আর চক্ষু খুললে কি ঈশ্বর নাই?'' ''মানুষে তাঁর বেশি প্রকাশ।'' ''প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয় আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না?''—শ্রীরামকৃষ্ণের এ-সমস্ত বাণী নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল মানুষের সামনে।

পাথরের মূর্তির মধ্যে যিনি প্রকাশিত হন, তিনিই জীবন্ত মানুষের মধ্যে সচল। তাই অন্যের দুঃখে দুঃখ অনুভবই শুধু নয়, সেই দুঃখ নিবারণের জন্য যে-প্রয়াস তার মূল্য অপরিসীম। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' কথাটির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক চেতনাকে জাগ্রত করার পথ করে দিলেন সেবার দ্বারা। জীবসেবাতেও ভগবানের সান্নিধ্যলাভ করা যায়—এ শুধু কথার কথা নয়, সত্য সত্যই ভগবানলাভের একটি পথ—এইটি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম 'মিশন'।

মানুষের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসা কেবল তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের উদ্দেশ্য শুধু 'আত্মনো মোক্ষার্থং' নয়, 'জগদ্ধিতায়'ও বটে। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদর্শ তাই 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে একবার বৈষ্ণব শাস্ত্র আলোচনা হচ্ছিল, যেখানে 'নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণবপূজন'—এই তিন আদর্শের কথা বলা হয়েছে। 'জীবে দয়া'-র কথা শুনেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলে ওঠেন, ''কীটাণুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা!'' যথার্থভাবে তিনি বুঝিয়ে দেন, জীবকে দয়া করার ক্ষমতা মানুষের নেই—দয়ার মধ্যে অহংকারের ভাব থাকে। করতে

হবে শিবজ্ঞানে জীবের সেবা। সেদিন সেখানে অনেকেই উপস্থিত থাকলেও একথার তাৎপর্য একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সঠিকভাবে বুঝেছিলেন। তিনি বাইরে এসে বলেছিলেন, ''আজ ঠাকুরের মুখে কী অদ্ভুত কথাই না শুনলাম! ভগবান যদি কখনও দিন দেন, তবে আজ যা শুনলাম, পণ্ডিত-মূর্খ-ধনী-দরিদ্র-ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলকে তা শোনাব।''

বিদেশে বেদান্তপ্রচার করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেও শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাটি স্বামীজীর সর্বদা গভীরভাবে স্মরণে ছিল। সেজন্য ফিরে এসে এই কাজের জন্য সন্ন্যাসী ও গৃহীদের নিয়ে ১৮৯৭ সালের ১ মে বলরাম বসুর বাড়িতে একটি সভা আহ্বান করেছিলেন। সেখানে তিনি বললেন, বিভিন্ন দেশ ঘুরে তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে সঙ্ঘ ছাড়া কোনও বড় কাজ হতে পারে না। তাই তিনি সঙ্ঘ গঠন করতে চান এবং সে-সঙ্ঘ ঠাকুরের নামেই প্রতিষ্ঠিত হবে। এইভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা হল।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য স্বামীজী স্থির করলেন, মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেসকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন তার প্রচার এবং মানুষের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে ওইসব তত্ত্ব প্রয়োগে সাহায্য করা। তারই সঙ্গে থাকবে মানুষের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের মাধ্যমে তাদের শিক্ষিত করে তোলা। সেই সমিতির সভাপতি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ; কলকাতা কেন্দ্রের সভাপতি হলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। পরে আরও বিশদভাবে এই মিশনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে স্বামীজী বলেছিলেন : এই মিশনের উদ্দেশ্য হবে মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত পথে চলে মুক্তিলাভের চেষ্টা করা। এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্যই হল শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি রেখে জীবসেবাকে প্রাধান্য দিয়ে মুক্তিলাভের দিকে এগিয়ে যাওয়া। সমাজসংস্কারের উপরে রামকৃষ্ণ মিশন বেশি গুরুত্ব দেবে না, কারণ সামাজিক দোষগুলি একটি রোগের মতো। তাই সমাজকে সুদৃঢ় করতে পারলেই এই ব্যাধিগুলি আপনা-আপনি চলে যাবে।

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীশ্রীমায়ের আকুতি ভোলা যায় না। তিনি ১৮৯০ সালের প্রথমদিকে বোধগয়া গিয়েছিলেন। সেখানকার মঠের সুন্দর ব্যবস্থা দেখে ঠাকুরের কাছে তিনি কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করেন, ''ঠাকুর, তুমি এলে এই ক-জনকে নিয়ে লীলা করে আনন্দ করে চলে গেলে; আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল? তাহলে আর এত কষ্ট করে আসার কি দরকার ছিল? কাশী বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিক্ষা করে খায় আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সে রকম সাধুর তো অভাব নেই। তোমার নাম করে সব ছেড়ে বেরিয়ে আমার ছেলেরা যে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে তা আমি দেখতে পারব না। আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব তোমাকে, আর তোমার ভাব উপদেশ নিয়ে একত্র থাকবে। আর এই সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে।''

শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র ঠাকুরের শেষ অসুখের সময় নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর একদিন তিনি অফিস থেকে ফিরে সন্ধ্যার সময় বাড়িতে ঠাকুরের ছবির সামনে বসে ধ্যান করছেন, এমন সময় ঠাকুর তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন, ''তুই করছিস কি? আমার ছেলেরা সব পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তার আগে একটা ব্যবস্থা কর।'' ঠাকুরের এই কথা শুনে তিনি ছুটে প্রতিবেশী নরেনের কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দর্শনের কথা জানিয়ে বললেন, ''ভাই একটা আস্তানা ঠিক কর, যেখানে ঠাকুরের ছবি, ভস্মাদি আর তাঁর ব্যবহৃত জিনিসগুলি রেখে রীতিমতো পূজার্চনা ইত্যাদি ঠিকমতো চলতে পারে,

যেখানে তোমরা কামকাঞ্চনত্যাগী ভক্তেরা এক জায়গায় থাকতে পার। মাঝে মাঝে আমরা গিয়ে সেখানে জুড়ুতে পারব। আমি কাশীপুরে মাসে মাসে যে টাকা দিতাম, এখনও তাই দেব।" সুরেশচন্দ্র ধন্য। যুগাবতারের নির্দেশে তাঁর দানেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম মঠ স্থাপিত হল।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর স্বামী বিবেকানন্দ প্রায় তিন বছর বরানগর মঠে থেকে পরে সারা ভারতে আরও তিন বছর পরিভ্রমণ করেছিলেন। সেইসময় নিজের চোখে তিনি সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা আর দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। একইসঙ্গে তিনি এও বুঝেছিলেন যে, তারই মধ্যে ভারতের প্রাণ, ভারতের মেরুদণ্ড যে-আধ্যাত্মিকতা তা অটুট আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মত, খালি পেটে ধর্ম হয় না। স্বামীজী ভারতপরিক্রমাকালে সাধারণ মানুষের দুঃখ, দারিদ্র্য দেখে তা গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। তিনি এই দুর্দশা দূর করার উপায় খুঁজতে লাগলেন। আর তখনই শুনলেন ধর্মমহাসভার কথা। আমেরিকায় গিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন সঙ্ঘ ছাড়া তাঁর পরিকল্পনামতো কাজ সম্ভব হবে না।

স্বামীজী অন্তরে দৃঢ়ভাবে অনুভব করেছিলেন যে শিকাগো ধর্মমহাসভা তাঁর জন্যই অপেক্ষা করে আছে। আর শুধু শিকাগোই নয়, স্বামীজীর প্রধান কাজ ছিল সমগ্র পাশ্চাত্যে মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব সম্পর্কে তাদের অবহিত করা। ধর্মমহাসভার পরে প্রায় তিন বছর তিনি সেখানে ছিলেন এই কাজের জন্যই। বিদেশে স্বামীজী যা করেছিলেন, তাকে এককথায় প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয়—বেদান্তের মূল তত্ত্বগুলি মানুষের সামনে তুলে ধরা এবং প্রতি কাজে ও চিন্তায় সেগুলির সঠিক প্রয়োগ তাদের শেখানো। এ-কাজে তাঁকে যেমন প্রবল বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছিল, তেমনই তাঁর দৃঢ়, পবিত্র, সৎ চরিত্র এবং গভীর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে তিনি বহু সৎ ও উদার মানুষের বিশ্বাস, ভালবাসা ও সাহায্য অর্জন করতে পেরেছিলেন। ধর্ম সম্পর্কে এত উদার এবং সারগর্ভ কথা এই প্রথম সেখানকার মানুষ শুনলেন। তাতে তাঁদের মনের প্রসারতা এত বৃদ্ধি পেল যে তাঁদের অনেকেই স্বামীজীকে ভারতবর্ষের কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন।

১৮৯৭ সালের ১৫ জানুয়ারি স্বামীজী ভারতে ফিরে আসেন। কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়ে সারা ভারতে বক্তৃতা দিতে লাগলেন তিনি। তাঁর প্রভাবে দেখা গেল এক অভূতপূর্ব জাগরণ। ভারতবর্ষের মানুষ যেন তাঁর কথা শুনে মৃত্যুশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

স্বামীজী বলতেন, সন্ন্যাসীকে সবসময় মনে রাখতে হবে যে তার জীবন নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়—অন্যের উন্নতির জন্য, অন্যের আনন্দের জন্য। সন্ন্যাসের আদর্শ 'self liberation'—নিজের মোক্ষের চেষ্টা, সঙ্গে সকলের কল্যাণ সাধন। এতদিন ভগবানলাভই ছিল সন্ন্যাসের আদর্শ। জীবের মধ্যে শিবকে দর্শন করে তাঁর সেবা—দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক—শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাবটিকে স্বামীজী রূপ দিলেন 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর মাধ্যমে। এই সেবা জীবনে রূপায়িত করতে গেলে কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি-যোগের সমন্বয় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ঘটে। স্বামীজী দেখেছেন এই সমন্বয় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সুচারুরূপে ঘটেছিল; তাই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত সকলের জীবনেই এই চারটি যোগের সমন্বয় দেখতে চেয়েছেন তিনি। স্বামীজীকে বলা হয় শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত তত্ত্বের ভাষ্য। তাঁর গুরুভাইরা তা কাজে পরিণত করেছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর নেতৃত্বে। সেই পথেই আজ এগিয়ে চলেছে সঙ্ঘ। যুগাবতারের এই 'মিশন'ই মানবসভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে—সমৃদ্ধি, শান্তি ও আনন্দের পথে।